বদর যুদ্ধ

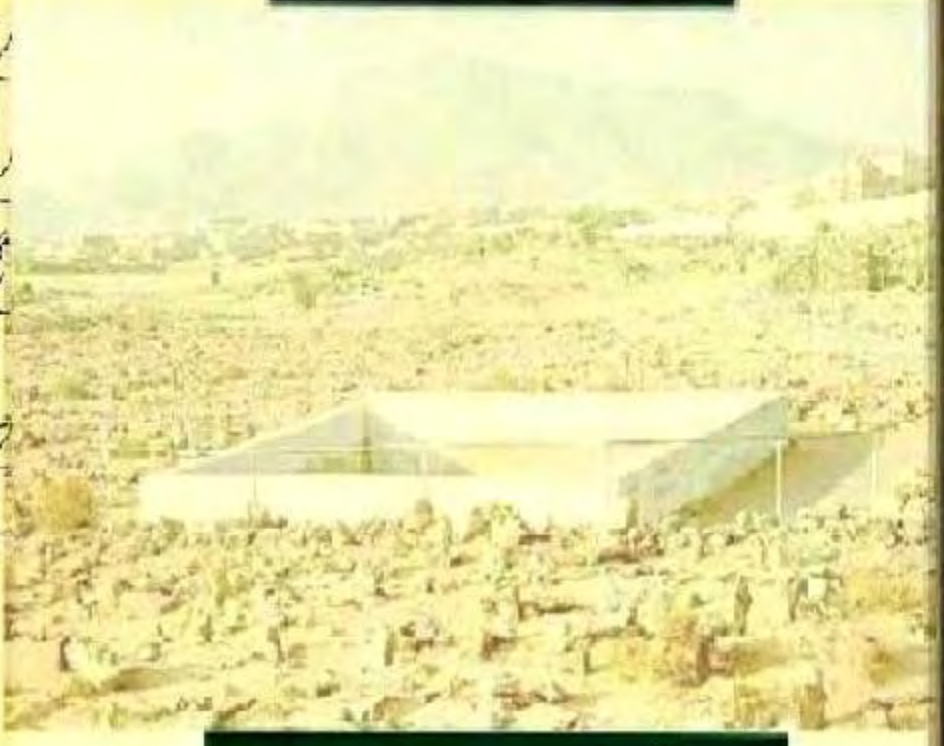

হাফেজ এম.এ. জলিল

প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (রাঃ)

বদর যুদ্ধ

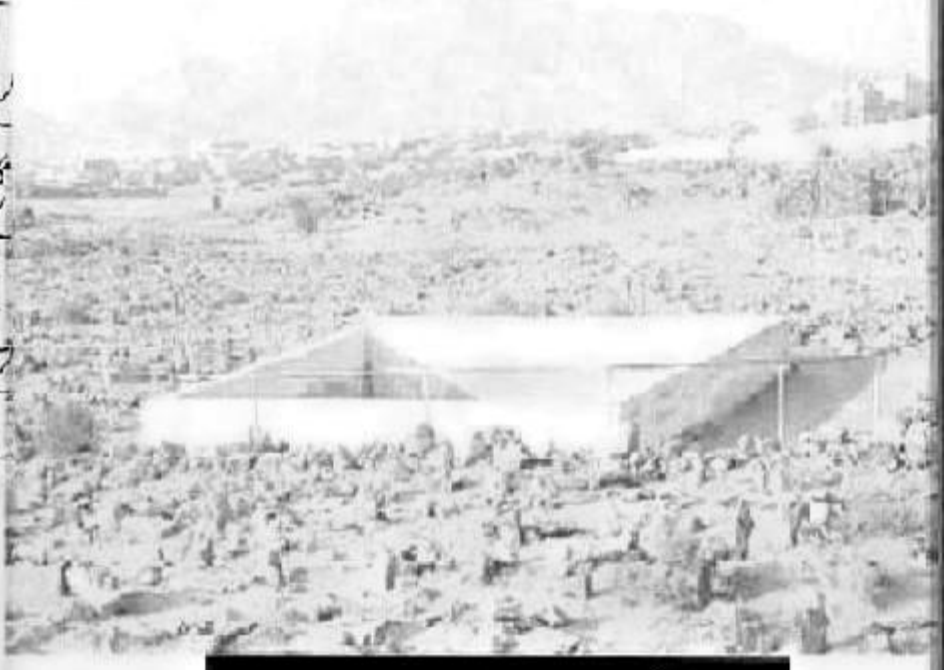

হাফেজ এম.এ. জলিল

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউশন ট্রাস্ট (রেজিস্টার্ড)

চৌত্রিশতম অধ্যায়

বদর যুদ্ধ

প্রসঙ্গ ঃ হক্ব ও বাতিলের ফয়সালা এবং অসংখ্য ইলমে গায়েবের মো'জেযা প্রকাশ

বদরের জিহাদ ছিল হক্ব ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী যুদ্ধ। নবী করিম (দঃ)-এর অসংখ্য মো'জেযা এতে প্রকাশ পায়। এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় বদরের ময়দানে ১৭ই রমযান দ্বিতীয় হিজরীতে। বদর মদিনা শরীফ হতে সোজাপথে ৮০ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত। এক ব্যক্তির নাম ছিল বদর। সে একটি কূপ খনন করেছিল। তার নামানুসারে ঐ এলাকা ও কূপের নাম রাখা হয় বদর। ঘটনাক্রমে পরিকল্পনা ছাড়াই এই যুদ্ধ ঘটে যায়। ঘটনাটি নিম্নরূপ–

নবী করিম (দঃ)-এর হিজরত করে মদিনায় গমন এবং তথায় ইসলামের প্রসার দেখে মক্কার কোরাইশগণ জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছিল। কিভাবে ইসলামের প্রসার রোধ করা যায় এবং কিভাবে মুসলমানদের শেষ করা যায়– এই ভাবনা তাদের পেয়ে বসে। তারা পরামর্শ করে স্থির করলো– যুদ্ধই ইসলামকে খতম করার একমাত্র উপায়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা প্রথমে অস্ত্র সংগ্রহ করার দিকে মনোযোগ দিল। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এক বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়ায় গমন করলো। মক্কার কোরাইশরা সোনা চান্দি, গহনাপত্র ও অন্যান্য মাল সামানা সিরিয়ায় প্রেরণ করলো। বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা যুদ্ধাস্ত্র খরিদ করে আবু সুফিয়ানের কাফেলা মক্কার দিকে রওয়ানা দিলো। উক্ত কাফেলার নিরাপত্তার জন্য ৪০ জন সসস্ত্র অশ্বারোহী সাথে রাখলো।

তারা মদিনার কাছাকাছি পৌঁছলে হযরত জিব্রাইল (আঃ) নবী করিম (দঃ) কে উক্ত কাফেলার গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বের হতে আরয করলেন। নবী করিম (দঃ) মোহাজির ও আনসার মিলিয়ে মোট ৩১৩ জনের একটি দল নিয়ে আবু সুফিয়ানের অস্ত্র কাফেলার গতি রোধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। আবু সুফিয়ান গুপ্তচর মারফত এই সংবাদ পেয়ে লোহিত সাগরের উপকূল ধরে অন্য পথে দ্রুতগতিতে বিপজ্জনক স্থান অতিক্রম করে চলে গেলো। সে পূর্বেই গুপ্তচর মারফত মক্কায় আবু জাহলকে নবী করিম (দঃ)-এর আগমনের খবর পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। নবী করিম (দঃ) রাওহা নামক স্থানে পৌঁছে খবর পেলেন–আবু সুফিয়ানের অস্ত্রকাফেলা নিরাপদে উপকূল ধরে চলে গেছে। এ সময়ে আল্লাহ

তায়ালা নবী করিম (দঃ) কে মক্কা থেকে আগত আবু জাহল বাহিনীর কথা জানিয়ে দিলেন এবং মোকাবেলার নির্দেশ দিলেন। বিজয়ের শুভ সংবাদও প্রদান করলেন। আল্লাহ পাক জিব্রাইল মারফত একথাও বলে পাঠালেন যে, **"দুটি দলের মধ্যে একটিতে তোমাদের বিজয় হবে"** (আনফাল-৭)। (প্রথম দল আবু সুফিয়ান এবং দ্বিতীয় দল আবু জাহল)।

এদিকে আবু জাহল আবু সুফিয়ানের কাফেলার সাহায্যার্থে এক হাজার লোকের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রওয়ানা দিল। তার কাফেলায় ছিল ৭০০ উট এবং একশত ঘোড়া ও প্রচুর রসদ। যুদ্ধ কাফেলা প্রস্তুতকালে আবু জাহল উক্ত বাহিনীতে নবী করিম (দঃ)-এর চাচা আব্বাস, দুই চাচাতো ভাই আকিল ও নওফেল এবং জামাতা আবুল আছকেও যোগদান করতে বাধ্য করলো। আব্বাসের নিকট থেকে চাঁদাস্বরূপ বিশ উকিয়া স্বর্ণ আদায় করা হলো। (এক উকিয়া তৎকালীন ৪০ দীনার ও বর্তমানের কয়েক লক্ষ টাকা)।

এ সময় শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করে আবু জাহলকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিতে লাগলো এবং বললো– **"আমি মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী কেনানী গোত্রের লোক। আমার নাম সুরাকা ইবনে মালেক কেনানী। আমার এলাকা দিয়ে যাতায়াতকালে আপনার বাহিনীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে এবং আমার গোত্রের লোকজন দিয়েও আপনাদের সাহায্য করা হবে"**। (হিজরতের সময় এই সুরাকা কেনানী হুযুর (দঃ) কে ধরতে গিয়েছিলো)।

সুরা আনফাল ৪৮নং আয়াতে শয়তানের এই কুমন্ত্রণা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে ঃ

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ-

অর্থ–**"হে রাসুল! স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা, যখন শয়তান আবু জাহলের বাহিনীকে এই বলে উৎসাহিত করছিলো যে, এই যুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে কেউ জয়লাভ করতে পারবেনা– বরং তোমরাই হবে বিজয়ী এবং আমি তোমাদের সাথেই থাকবো"** (সুরা আনফাল ৪৮ আয়াত)।

শয়তান এভাবে প্ররোচনা দিয়ে আবু জাহলকে তার বাহিনীসহ তাদের মরন ফাঁদ স্বরূপ বদর ময়দানে পৌঁছাতে সাহায্য করলো। কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হলো এবং আসমান থেকে পাঁচ হাজার ফেরেস্তা সৈন্য নেমে এসে নবী করিম (দঃ)-এর সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিল, তখন শয়তান পিছু হটতে আরম্ভ করলো। আবু

জাহল বললো–কি ভাই! আমাদেরকে একা ফেলে তুমি কোথায় যাচ্ছো? তখন শয়তান বললো–

إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ–

অর্থ–"আমি তোমাদের থেকে সরে দাঁড়ালাম। কেননা, আমি যা দেখতে পাচ্ছি (ফেরেস্তাদলকে) তোমরা তা দেখতে পাচ্ছনা। আমার অন্তরে খোদার ভীষণ ভয়। আর আল্লাহ্‌র শাস্তি অতি কঠিন"। (সুরা আনফাল ৪৮ আয়াত)।

এভাবে কুপরামর্শ দিয়ে শয়তান আবু জাহলকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিল। মানুষ শয়তানরাও এভাবে অন্যকে উসকানী দিয়ে পরে সরে দাঁড়ায়।

আবু জাহল সসৈন্যে রওয়ানা দিয়ে পথিমধ্যে গুপ্তচর মারফত সংবাদ পেলো যে, আবু সুফিয়ানের অস্ত্রকাফেলা সাগরের উপকূল ধরে নিরাপদে চলে এসেছে। আবু জাহলের দলের লোকজন বললো, এবার আর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নেই, মক্কায় প্রত্যাবর্তন করাই উত্তম। কিন্তু আবু জাহল নাছোড়বান্দা। সে বললো– আমরা বদর ময়দানে গিয়ে আনন্দ ফূর্তি করবো, শরাব পান করবো, গায়িকাদের গান শুনবো এবং বিরাট যিয়াফত দিয়ে তারপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবো (রুহুল বয়ান)। একথা বলে সে বদর ময়দানের দক্ষিণ প্রান্তে মক্কার দিকে নিম্নভূমিতে সুবিধামত স্থানে তাঁবু স্থাপন করলো এবং আনন্দ ফুর্তিতে মেতে উঠলো। সে জানতোনা– মুসলিমবাহিনী পূর্ব থেকেই রাওহায় অবস্থান করছেন।

আবু জাহলের বাহিনীর সংবাদ পেয়ে নবী করিম (দঃ) ৩১৩ জন সাহাবাকে নিয়ে বদর ময়দানে মদিনার দিকের উত্তরাংশে উঁচু ভূমিতে এসে তাঁবু ফেললেন। কোরাইশদের বিরাট বাহিনী দেখে প্রথমতঃ মুসলমানদের মনে কিছুটা দুর্বলতা দেখা দিলো। কিন্তু নবী করিম (দঃ) তাঁদেরকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে বিজয়ের আশ্বাস দিয়েছেন। আমি কুরাইশদের ৭০ সর্দারের নিহত হওয়ার স্থানও দেখতে পাচ্ছি। একথা বলে নবী করিম (দঃ) হাতের লাঠি দিয়ে এক একটি জায়গা চিহ্নিত করে বলতে লাগলেন– এটি আবু জাহেলের ভূলুণ্ঠিত হওয়ার জায়গা, এটি ওৎবার, ঐটি অলিদের, অমুক জায়গা শায়বার বধ্যভূমি হবে- ইত্যাদি।

যুদ্ধ শেষে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর গায়েবী সংবাদের সত্যতা বাস্তবে দেখার জন্য অনুসন্ধান করে দেখতে পেলেন– হুযুর আকরাম (দঃ) যেখানে যার নাম ধরে জায়গা চিহ্নিত করেছিলেন, ঠিক সে জায়গাতেই তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। নবী করিম (দঃ)-এর আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলমে

গায়েব দেখে সাহাবায়ে কেরামের ঈমান আরও দৃঢ় হয়ে গেলো। (বেদায়া ও নেহায়া)

[কোরআনে আছে- (নবী ব্যতিত) **"কোন মানুষই নিজে নিজে জানেনা- সে কোন্ স্থানে মারা যাবে"**। ইহা আল্লাহর ইলমে গায়েব যাতী সম্পর্কিত আয়াত। ইহার সাথে রাসুলে পাকের (দঃ) ইলমে গায়েব আতায়ীর কোন বিরোধ নেই। নবীজীর এ সম্পর্কিত ইলমে গায়েব সূরা নিসা ও সূরা জ্বীন-এ উল্লেখ করা হয়েছে।]

বদর ময়দানের যে অংশে নবী করিম (দঃ) অবস্থান গ্রহণ করেন-সেটি ছিল যুদ্ধের জন্য অনুপযুক্ত স্থান। কেননা, জায়গাটি ছিল বালুময় এবং পানিশূন্য। অপর দিকে, আবু জাহলের অংশ ছিল নিম্নভূমি এবং তাতে পানির সুবিধাও ছিল। আল্লাহর হুকুমে রাত্রে প্রচুর বৃষ্টি হলো। ফলে উচু ভূমির বালু হলো শক্ত এবং নিম্নভূমির মাটি হলো কর্দমাক্ত ও যুদ্ধের জন্য অনুপযুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গর্ত করে প্রয়োজনীয় পানি আটকে রাখলেন।

রমযানের ১৭ তারিখ যুদ্ধ শুরু হলো। নবী করিম (দঃ) একটি তাঁবুতে নামাযের সিজদায় পড়ে এ বলে কাঁদ্‌তে লাগলেন- "হে আল্লাহ! আমার এই সল্প সংখ্যক সাহাবী যদি শহীদ হয়ে যায়- তবে তোমার নাম কে নেবে? আমি তোমার নামের উছিলা ধরে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি"। (হাদীস)

এই অসহায়ত্ব প্রকাশ করা উম্মতের শিক্ষার জন্য ছিল। নতুবা তিনি তো পূর্বেই বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। নবী করিম (দঃ) নামায অবস্থায় মূহুর্তের জন্য তন্দ্রামগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি দেখতে পেলেন- সাদা পাগড়ী পরিহিত এক হাজার ফেরেস্তা মুজাহিদগণের সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ফেরেস্তাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে তিন হাজার ও পাঁচ হাজারে উন্নীত হলো। কোরআন মজিদের সুরা আলে-এমরানের ১২৩, ১২৪, ১২৫ আয়াতে ৫০০০ হাজার অশ্বারোহী ফেরেস্তা অবতরনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বদরের যুদ্ধে ফেরেস্তাগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন-কিন্তু কিভাবে শত্রু নিধন করতে হয়-তা তাদের জানা ছিলনা। আল্লাহ তায়ালা সুরা আনফাল ১২নং আয়াতে তাঁদেরকে শত্রুর উপর আঘাত হানার কৌশল শিক্ষা দিয়ে ইরশাদ করেন-

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ-

অর্থ-**"আল্লাহ বললেন-হে ফেরেস্তাগণ, তোমরা শত্রুদের গর্দানের উপরিভাগে আঘাত হানো; আরো আঘাত হানো প্রত্যেক গিরায় গিরায়"** (আনফাল)।

ফেরেস্তাগণ কর্তৃক শত্রু নিধনের আলামত ছিল- গলায় কালো দাগ। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা তরবারী দ্বারা আঘাত করার পূর্বেই কাফেরদের মস্তক দ্বিখন্ডিত হয়ে পড়তো। এভাবে ৭০ জনের মধ্যে ৬৪ জনই ছিল ফিরিস্তার আঘাতে নিহত। আমাদের হাতে মাত্র ৬ জন নিহত হয়েছে (তাফসীরে রুহুল বয়ান)।

পরবর্তী তিনটি যুদ্ধে ফেরেস্তাগণ সাহায্যার্থে আগমন করেছিলো–কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। ঐ তিনটি যুদ্ধ ছিল- খন্দক, মক্কা বিজয় ও হোনাইন। ঐ সময় ফেরেস্তাদের পাগড়ী ছিল যথাক্রমে কাল এবং সবুজ। সুতরাং মানুষের পাগড়ী সাদা, কালো অথবা সবুজ হওয়া উত্তম। ফিরিস্তাদের অনুসরনের নামও ইবাদত–যদি নবীজীর অনুমোদন থাকে।

যুদ্ধে দুই কিশোরের অংশ গ্রহণ ঃ

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মোআয ও মোআওয়ায নামক দু'জন বালক আগ্রহ প্রকাশ করলে নবী করিম (দঃ) তাদের শান্ত্বনা দিয়ে পরবর্তী কোন এক যুদ্ধে তাদের নেয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তাঁদের একজন পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে লম্বা হয়ে দাঁড়ালো। নবী করিম (দঃ) তাঁর আগ্রহ দেখে অভিভূত হয়ে তাঁকে সৈন্যদলে ভর্তি করে নিলেন। এ অবস্থা দেখে অপর সাথী বললো- "সে লম্বা হলে কি হবে, মল্লযুদ্ধে সে আমার সাথে পারবেনা"। এ বলে সে মল্লযুদ্ধে ওকে হারিয়ে দিলো। নবী করিম (দঃ) তাকেও সৈন্যবাহিনীতে নিয়ে নিলেন। এ ছিল তৎকালীন কিশোর বালকদের নবীপ্রেমের নমুনা!

তাঁরা দু'জন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নবীজীর দুশমন আবু জাহলকে অনুসন্ধান করতে লাগলো। একজন সাহাবীর মাধ্যমে তাঁরা আবু জাহলকে চিনে নিলো। আবু জাহল ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের তদারকী করছিলো। বালকদ্বয় বাজপাখীর ন্যায় আবু জাহলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তার ঘোড়ার পা কেটে ফেললো। আবু জাহল মাটিতে পড়ে গেলো। তাঁরা আবু জাহলকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তড়িৎ গতিতে এগিয়ে এসে আবু জাহলের শিরশ্ছেদ করে ফেললেন। এভাবে নবীজীর বড়শত্রু আবু জাহল ছোট দুই বালকের হাতে নিহত হলো। একেই বলে কাঁদায় পড়ে হাতীর মৃত্যু–একেই বলে বালকদের নবীপ্রেম (রুহুল বয়ান)।

[নবীজীর দুশমনদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করাই সত্যিকার ঈমানের পরিচায়ক]

যুদ্ধ শুরুঃ

বদরে প্রথমে মল্লযুদ্ধ শুরু হলো। কোরাইশদের পক্ষে ওত্‌বা, তাঁর ভাই শায়বা এবং ছেলে ওলীদ- এই তিনজন ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে মুসলমানদেরকে মল্লযুদ্ধে

আহবান করলো। আনসারগণের মধ্য হতে তিনজন অগ্রসর হলে কোরাইশরা বললো– তোমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা চাই আমাদের সমকক্ষ কোরাইশ বীর। নবী করিম (দঃ)-এর ইঙ্গিতে হযরত ওবায়দা (রাঃ), হযরত হাম্‌যা (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) মল্লযুদ্ধে এগিয়ে আসলেন। হযরত হাম্‌যা (রাঃ) এক আঘাতেই শায়বাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। হযরত আলী (রাঃ) অলীদকে দ্বিখন্ডিত করে ফেললেন। হযরত ওবায়দা (রাঃ) ওত্‌বার সাথে মল্লযুদ্ধে পেরে উঠছিলেন না। হযরত হাম্‌যা ও আলী (রাঃ) অগ্রসর হয়ে ওত্‌বার উপর হামলা চালালেন এবং তাকে নিহত করলেন। ওত্‌বার কন্যা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা পরবর্তী বছর ওহোদ যুদ্ধে এই পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলো। সে হযরত হামযা (রাঃ)-এর কলিজা বের করে চিবিয়ে খেয়েছিল এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করে মালা বানিয়ে গলায় পরেছিল। ফতেহ্ মক্কায় সে মুসলমান হয়।

তিন বীরের ধরাশায়ী হওয়ার দৃশ্য দেখে কোরাইশ বাহিনী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রচন্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলো। একদিকে এক হাজার দূর্ধর্ষ যোদ্ধা, অপরদিকে ৩১৩ জন নিরস্ত্র প্রায় মুসলিম বাহিনী।

খেজুরের ডাল তলোয়ার হয়ে গেলো ঃ

উক্ত যুদ্ধে হযরত ওকাশা (রাঃ) নামক জনৈক সাহাবীর তরবারী ভেঙ্গে যায়। নবী করিম (দঃ) তাঁকে খেজুরের একটি শুকনো ডাল দিয়ে বললেন– তুমি এটা দিয়ে যুদ্ধ করো। আল্লাহর কুদ্‌রতে খেজুরের ডাল ইস্পাতের তলোয়ারে পরিণত হয়ে গেলো। এই তলোয়ারের নাম রাখা হয় 'আউন' বা আল্লাহর সাহায্য। হযরত ওকাশা (রাঃ) জীবনভর উক্ত তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ!

[হযরত মুছা (আঃ)-এর হাতের লাঠি হয়েছিল অজগর, আর নবী করিম (দঃ)-এর হাতের পরশে খেজুরের ডাল হলো ইস্পাতের তালোয়ার। এর চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় ছিল– নবীজীর পরশে ঈমানশূন্য হৃদয়গুলোও আল্লাহর আরশে পরিণত হয়েছিল।]

ভাঙ্গা হাত জোড়া লাগল ঃ

বদরের যুদ্ধে হযরত মুয়ায ইবনে আমর (রাঃ)-এর একটি হাত আবু জাহলের পুত্র ইকরামার তরবারীর আঘাতে দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়। মুয়ায (রাঃ) হাতের খন্ডিত অংশসহ নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। হুযুর পাক (দঃ) একটু থুথু মোবারক লাগিয়ে খন্ডিত অংশ সংযুক্ত করে দিলেন। সাথে সাথে হাত জোড়া লেগে গেলো। হযরত মুয়ায (রাঃ) উক্ত হাত নিয়ে সুস্থ অবস্থায় হযরত ওস্‌মান (রাঃ)-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

[সাহাবায়ে কেরামের আক্বিদা ছিল- নবী করিম (দঃ) আল্লাহর প্রতিনিধি। তাঁর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য গোপন শক্তি প্রদান করেছেন। তিনি দ্বিখন্ডিত হাত ভাল করতে পারেন। সামান্য খেজুরের ডালকে তলোয়ারে পরিণত করতে পারেন। যারা এই বিশ্বাস রাখে– তারাই আহলে সুন্নাত।]

যুদ্ধের ফলাফল ঃ

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ১৪ জন শহীদ হন। তন্মধ্যে ৬ জন মোহাজির এবং আটজন আনসার। অপরপক্ষে কোরাইশ বাহিনীর মধ্যে ৭০ জন নেতৃস্থানীয় লোক নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। নিহতদের মধ্যে ছিল আবু জাহল, ওত্‌বা, অলিদ, শায়বা- প্রমুখ নেতা।

বন্দী ৭০ জনের মধ্যে নবী করিম (দঃ)-এর চাচা আব্বাস, বড় জামাতা আবুল আ'ছ, চাচাত ভাই আকিল এবং নওফেল– এই চারজন ছিলেন নবী করিম (দঃ)-এর আপনজন। বদরের যুদ্ধে কোরাইশরা পর্যূদস্ত হয়ে যায়। যুদ্ধের ময়দানে মালদৌলত ও রসদপত্র এবং অস্ত্র-সস্ত্র ফেলে তারা পলায়ন করে। তাদের মাল-সামান ও ইজ্জত আবরু ধূলায় ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়। তাদের শোচনীয় পরাজয়ে ইসলামের বিজয় ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম একটি নূতন শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আল্লাহ তায়ালা বদর দিবসকে يَوْمَ الْفُرْقَانِ **"হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী দিবস" হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।**

নবীজীর হাতই আল্লাহর হাত ঃ

এই যুদ্ধের শুরুতে নবী করিম (দঃ) এক মুষ্টি কঙ্কর নিয়ে شاهت الوجوه বলে ঐগুলোতে ফুঁক দিয়ে দূর থেকে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করেন। উক্ত কঙ্কর প্রত্যেক শত্রুসেনার চোখে গিয়ে পড়ে। এতে তারা দিশেহারা হয়ে যায় এবং তাদের দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটে। আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনা বর্ণনাকালে এরশাদ করেন–

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى -

"হে রাসুল, আপনি যখন কঙ্কর নিক্ষেপ করছিলেন– তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি– মূলতঃ আল্লাহ তায়ালাই নিক্ষেপ করেছেন"। (সুরা আনফাল)।

[এখানে নবী করিম (দঃ)-এর হাতকে আল্লাহ তায়ালা নিজের হাত এবং নবী করিম (দঃ)-এর কঙ্কর নিক্ষেপকে আল্লাহর নিজের নিক্ষেপ বলেছেন। প্রকৃত পক্ষে– নবী করিম (দঃ) ছিলেন আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতের প্রকাশস্থল বা মাযহার। নবী করিম (দঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আপন শক্তি ও

কুদরত প্রকাশ করেছেন। "নবীর কথা আল্লাহর কথা, নবীর কাজ আল্লাহর কাজ, নবীর মায়া আল্লাহর মায়া, নবীর নারাযী আল্লাহর নারাযী এবং নবীর সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি বলে বিবেচিত"। তিনি তো আল্লাহর অতি ঘনিষ্ট বন্ধু!

এই পর্যায়কে তরিকতের ভাষায় ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ্ (আল্লাহতে লীন হয়ে আল্লাহতে অস্তিত্ববান) বলা হয়। এই স্তরে পৌঁছলে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকে না। এই অবস্থায় বান্দা সৃষ্টি জগতে মোতাছারিরফ বা কর্তৃত্ববান হয়ে যান। যাহেরী অবস্থা মানুষের হলেও বাতেনী অবস্থা খোদায়ী গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। (যিয়াউল কুলুব-হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজির মক্কী- পৃষ্ঠা ২৯-৩০ দ্রষ্টব্য)। উল্লেখ্য- হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব ছিলেন আশ্রাফ আলী থানবীর পীর। পীর বলেন কী, আর মুরীদরা বলে কী!]

যুদ্ধ শেষে নবী করিম (দঃ)-এর নির্দেশে ৭০ জন নিহত কোরাইশ নেতার লাশ একটি গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। ঐ গর্তকে 'কালীবে বদর' বলা হয়। সমস্ত লাশ নিক্ষেপ করার তিনদিন পর নবী করিম (দঃ) উক্ত কূপ বা গর্তের মূখে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক লাশের নাম ধরে ডাক দিলেন এবং বললেন ঃ

يَافُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ حَقًّا!
فَاِنِّيْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيَ اللّٰهُ حَقًّا-

অর্থ-"**হে অমুকের পুত্র অমুক- হে অমুকের পুত্র অমুক! আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (দঃ) তোমাদের পরিণতি সম্পর্কে যে ওয়াদা করেছিলেন-তা কি তোমরা সত্য পেয়েছো? আমার সাথে আল্লাহ যে ওয়াদা করেছিলেন- তা আমি সত্য পেয়েছি**"। (হাদীস)

তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে আরও বললেন ঃ

يَا اَهْلَ الْقَلِيْبِ بِئْسَ الْعَشِيْرَةُ كُنْتُمْ كَذَّبْتُمُوْنِيْ وَصَدَّقَنِي النَّاسُ-

অর্থ-"**হে গর্তবাসীগণ! তোমাদের বর্তমান জীবন কতই না নিকৃষ্ট। যখন অন্যান্য লোকেরা আমাকে সত্য নবী বলে গ্রহণ করেছিল, তখন তোমরা আমাকে মিথ্যা মনে করতে**"। (হাদীস)

মৃতদের শ্রবণ শক্তি ঃ

হযরত ওমর (রাঃ) পাশেই দন্ডায়মান ছিলেন। তিনি আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি রুহ্‌বিহীন মৃত লাশের সাথে কিভাবে কথা বলছেন? তারা কি

আপনার কথা শুনে? নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন–

مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا شَيْئًا -

অর্থ–**"আমি যা বলছি–তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাচ্ছ না। কিন্তু কোন জবাব দেয়ার শক্তি এদের নেই"** (বুখারী)। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের শ্রবণ শক্তি জীবিতদের চেয়ে বেশী, কিন্তু জবাব দেবার শক্তি তাদের দেয়া হয়নি। এটাই সুন্নি আক্বিদা।

[এই হাদীসখানা সহিহ্ বোখারীতে বর্ণিত। এই হাদীসের দ্বারাই মৃত ব্যক্তিগণ কর্তৃক জীবিত ব্যক্তিদের কথাবার্তা শ্রবণের প্রামানিক দলিল পাওয়া যায়। মৃত কাফেরগণকে যদি এই শ্রবণ শক্তি দেয়া হয়, তাহলে মুসলমান ওলী, গাউছ ও কুতুবগণের শ্রবণ শক্তি যে আরো কত বেশী– তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইমাম গাযালী (রাঃ), মোল্লা আলী ক্বারী এবং আল্লামা মানাভী তাদের নিজ নিজ গ্রন্থ– যথাক্রমে ইহ্ইয়াউল উলুম, মিরকাত ও তাইছির-এ বর্ণনা করেছেন–

إِذَا تَجَرَّدَتِ النُّفُوسُ الْقُدْسِيَّةُ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ اتَّصَلَتْ إِلَى الْمَلَاءِ الْأَعْلَى وَتَسِيرُ فِي أَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ حَيْثُ تَشَاءُ وَتَرَى وَتَسْمَعُ الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ-

অর্থ–**"পবিত্র আত্মাসমূহ (ওলী আল্লাহ) যখন দেহ-পিঞ্জরমুক্ত হয়ে যায়–তখন উর্দ্ধজগতের ফেরেস্তাদের সাথে মিশে যায় এবং আসমান-জমিনের বিভিন্ন স্থানে যেখানে ইচ্ছা– তাঁরা ভ্রমণ করতে পারেন এবং জীবিত ব্যক্তিদের ন্যায়ই তাঁরা সব কিছু দেখতে ও শুনতে পান"**। (মিরকাত)

[পাখীরা খাঁচার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যেভাবে মুক্ত বিহঙ্গের মত যথায় ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারে, তদ্রুপ পবিত্র আত্মাগণও মুক্ত বিহঙ্গের মতই দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অধিক শক্তি নিয়ে যথায় ইচ্ছা চলাচল করতে পারেন। এর বিস্তারিত বিবরণ আল্লামা জালালুদ্দীন ছুয়ুতি কৃত 'শরহে সুদূর' এবং ইমাম কুরতুবীর "আত–তাযকিরাহ" গ্রন্থে দেখুন।] আমার লিখিত নূতন কিতাব "হায়াত মউত ও কবর হাশর"–এ কবরী যিন্দেগী বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

রমযান মাসের ১৭ তারিখেই যুদ্ধ শেষ হয়। যুদ্ধের ১৩ দিন পর শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে নবী করিম (দঃ) নিজ পালিত পুত্র হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) কে যুদ্ধজয়ের সু-সংবাদসহ মদিনায় প্রেরণ করেন। যায়েদ (রাঃ) মদিনায় এসে দেখেন, নবী-তনয়া হযরত রোকাইয়া (রাঃ) কে দাফন করে লোকেরা হাত

মুখ ধূয়ে সবেমাত্র ঘরে ফিরেছেন। হযরত ওসমান (রাঃ) কে নবী করিম (দঃ) মদিনায় রেখে গিয়েছিলেন–অসুস্থ কন্যাকে সেবা সুশ্রূষা করার জন্য। এছাড়া আরও সাত জনকে মদিনায় থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তাঁরা সবাই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসাবে গণ্য হন এবং গণিমতের মালের অংশ লাভ করেন।

যুদ্ধবন্দীদের সাথে ব্যবহার– নবীজীর এলমে গায়েব প্রকাশ ঃ

নবী করিম (দঃ) যুদ্ধবন্দীসহ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবন্দীগণকে মসজিদে নববী সংলগ্ন স্থানে খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়। নবী করিম (দঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস-এর গায়ে জামা ছিলনা। তিনি শীতে কাঁপছিলেন। মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিজস্ব লম্বা জামা হযরত আব্বাসকে পরিধানের জন্য দান করে। এর বিনিময়ে নবী করিম (দঃ) তার মৃত্যুর পর নিজের জামা মোবারক তার কাফনের জন্য দান করে দেনা পরিশোধ করেন। এটা ছিল সৌজন্যমূলক বিনিময়। সুতরাং এর দ্বারা সে পরকালে উপকৃত হবেনা। হাঁ, মোমেনগণ যদি তাবাররুক হিসাবে নবী করিম (দঃ)-এর কোন পবিত্র জিনিস কাফনের সাথে নিয়ে যান– তবে অবশ্যই তা নাজাতের উছিলা হিসাবে গণ্য হবে। অনেক সাহাবীকে হুযুরের কিছু নিদর্শন তাঁদের কাফনের ভিতরে দিয়ে দাফন করা হয়েছিল।

তখনও পর্যন্ত যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয়নি। তাই নবী করিম (দঃ) পরামর্শ সভা আহবান করেন এবং সাহাবীগণের মতামত জানতে চান। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন– "নবী ও ইসলামের দুশমনদের কতল করা উচিত এবং আমাদের নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে নিজের হাতে কতল করা উচিত। আমার নিজ মামা হেশামকে আমার নিজ হাতে কতল করতে চাই। আলী তাঁর ভাই আকিলকে হত্যা করুক। হামযা তাঁর ভাই আব্বাসকে কতল করুক"। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) আরয করলেন–"যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক–এতে মানবিক উদারতা ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-উভয় দিকই রক্ষা পাবে"।

নবী করিম (দঃ) হযরত আবু বকরের (রাঃ) মতামত পছন্দ করে সামর্থবান বন্দীদের নিকট থেকে ২০ উকিয়া–মতান্তরে ৪০ উকিয়া করে জনপ্রতি ক্ষতিপূরণ আদায় করে ছেড়ে দেন এবং অসমর্থ যুদ্ধবন্দীদেরকে মুসলমানদের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেন। পৃথিবীর মানুষ হতবাক হয়ে যুদ্ধের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত প্রত্যক্ষ করলো– **"নবী করিম (দঃ) যুদ্ধবন্দীদেরকে ওস্তাদের সম্মান প্রদান করেছেন"। এই উদারতার নযির একমাত্র ইসলামেই পাওয়া যায়।**

[ওহী নাযিলের পূর্বে এই পরামর্শ নেয়া হয়েছিল। কেননা, যুদ্ধবন্দীর ব্যাপারে শরিয়তের বিধান বদর যুদ্ধের পরে নাযিল হয়। আল্লাহ তায়ালা এ ঘটনায় হযরত ওমর (রাঃ)-এর কঠোরতাকে পছন্দ করেছিলেন এবং অন্য সাহাবীদের পরামর্শের খারাপ পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু নবীজীর খাতিরে পরবর্তী সময়ে ছুরা মুহাম্মদ ৪নং আয়াত দ্বারা মুক্তিপণ গ্রহণকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। পূর্ণ আয়াতটি হলো–

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ـ حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ
فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ـ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ـ

অর্থ–**"অতঃপর তোমরা যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও–তখন তাদের গর্দান মারো। অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত করবে–তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলো। অতঃপর যুদ্ধ শেষে–হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, নাহয় তাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ লও"**। (ছুরা মুহাম্মদ ৪ আয়াত)

নবীবিদ্বেষীরা সুরা আনফালের ৬৭ নম্বর সতর্ককারী রহিতকৃত আয়াতকে পুঁজি করে নবীজীর শানে আঘাত করে থাকে।]

প্রথমেই হযরত আব্বাছের ওপর মুক্তিপণ ধার্য ঃ

এবার মুক্তিপণ আদায়ের পালা। নবী করিম (দঃ) প্রথমে আপন চাচা আব্বাস (রাঃ), জামাতা আবুল আছ, চাচাতো ভাই আকিল ও নওফেল– এই চারজন দিয়ে শুরু করেন।

নবী করিম দঃ)-এর নিজ কন্যা হযরত জয়নাব তাঁর মা হযরত খাদিজা (রাঃ) কর্তৃক উপঢৌকন স্বরূপ প্রদত্ত গলার হারখানা স্বামীর মুক্তির জন্য পাঠিয়ে দিলেন। নবী করিম (দঃ) অশ্রুস্বজল নেত্রে হারখানা উলটিয়ে পালটিয়ে দেখছিলেন এবং বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর কথা স্মরণ করে কাঁদছিলেন। সাহাবাগণ বিবি খাদিজা (রঃ)–এর সম্মানে বিনা পণে আবুল আছকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করলেন। নবী করিম (দঃ) গলার হার ফেরত দিয়ে মুক্তিপণ স্বরূপ হযরত জয়নবকে মদিনায় পাঠিয়ে দেয়ার শর্তে জামাতাকে মুক্তি দেন। অপর দু'জন আকিল ও নওফেল–এর উপর মাথাপিছু ২০ উকিয়া করে ৪০ উকিয়া– মতান্তরে ৪০ উকিয়া করে ৮০ উকিয়া এবং আব্বাসের একার উপর ৮০ উকিয়া ধার্য্য করে মোট ১৬০ উকিয়া স্বর্ণমুদ্রা মুক্তিপণ ধার্য্য করেন এবং হযরত আব্বাছ (রাঃ)-এর উপর এই মুক্তিপণ আদায়ের নির্দেশ দান করেন। (এক উকিয়া ৪০

দীনারের সমান–প্রতি দিনার সাড়ে বার টাকার সমান–যার (এক উকিয়া) মূল্য তৎকালীন ৫০০ টাকা)। এই হিসাবমতে ১৬০ উকিয়ার মূল্যমান দাঁড়ায় তৎকালীন ৫০০X১৬০ = ৮০,০০০/- আশি হাজার টাকা)।

[হযরত আব্বাছ এই বিরাট অংকের কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি বললেন– "আমি পূর্বে বিশ উকিয়া স্বর্ণ (৮০ দীনার বা এক হাজার টাকা) চাঁদা বাবদ আবু জাহলকে দিয়েছি– যা গণিমতের মাল হিসাবে বর্তমানে আপনার অধিকারে এসেছে। এছাড়া আমার আর কোন সম্পদ নেই–যার দ্বারা ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকার এত বিরাট অংকের মুক্তিপণ আদায় করতে পারি। নবী করিম (দঃ) বললেন –

فقال رسول الله فاين المال الذى دفنته انت وام الفضل تحت اسكفة الباب !
وقلت لها ان قتلت فهو لك للصبية فقال: والله يارسول الله ان هذا شئ لم
يطلع عليه غيرى وغير ام الفضل الا الله عزوجل الخ (بداية نهاية)

অর্থ–"নবী করিম (দঃ) বললেন– চাচাজান, আপনি মক্কা থেকে আসবার সময় আমার চাচী উম্মুল ফযলের নিকট আশি হাজার টাকা বা ১৬০ উকিয়া স্বর্ণমুদ্রা গচ্ছিত রেখে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন–যদি আমি যুদ্ধে মারা যাই, তাহলে এগুলো আমার সন্তানদের ভরণ পোষনের জন্য ব্যয় করবে। আমার চাচী এবং আপনি উক্ত স্বর্ণ মুদ্রাগুলো ঘরের দরজায় গোপন কুঠরিতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ঐ মুদ্রাগুলো কোথায়?"। তখন হযরত আব্বাছ (রাঃ) বললেন– "ঐ মালের খবর আল্লাহর পরে আমিও আমার স্ত্রী উম্মুল ফযল ছাড়া আর কেউ জানেনা– আপনি অন্ধকার রাত্রির এই ঘটনা জানলেন কী করে? হুযুর (দঃ) বললেন–এই গায়েবী খবর আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন"। তাই আমি ঐ গচ্ছিত পরিমান মালই চেয়েছি-এর বেশী চাইনি"।

হযরত আব্বাছ (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর ইলমে গায়েবের প্রমাণ পেয়ে হতবাক হয়ে গেলেন এবং সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু ৮ম হিজরীতে ফতেহ্ মক্কা পর্যন্ত তাঁর ইসলাম গ্রহণ গোপন রাখলেন। তিনি মক্কা শরীফ থেকে গোপন তথ্য মদিনায় পাঠাতেন এবং নিজের ঈমান ও নামায–রোযা গোপন রাখতেন। পারলে পড়তেন না পারলে নয়। হুযুর (দঃ) তাঁকে মোশরেকদের সাথে মিলে মিশে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন।–(শিফা শরীফ ও বেদায়া)। (শেখ সাদী (রহঃ) ৫ বছর সোমনাথ মন্দিরে ব্রাহ্মণবেশে থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সুলতান মাহমুদ গজনবীকে দিয়েছিলেন। এরূপ করা ইসলামী জিহাদের জন্য জায়েয।)

[নবী করিম (দঃ)-এর ইলমে গায়েবের প্রমাণ পেয়ে এবং স্বীকৃতি দিয়ে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ঈমান নসীব হলো–আর বর্তমানের ওহাবী মওদুদীবাদীরা ইলমে গায়েব অস্বীকার করে ঈমানহারা হলো। মানার নামই তো ঈমান। শুধু জানার নাম ঈমান নয়। কোরাইশ নেতাগণ কোথায় কখন মারা পড়বে, এর অগ্রীম সংবাদ প্রদান করা এবং সুদূর মক্কার অন্ধকার ঘরে লুক্কায়িত মালের সন্ধান দেয়া নবী করিম (দঃ)-এর ইলমে গায়েবের প্রকৃষ্ট দলীল।

ইবনে কাছির ও কাযী আয়ায (রাঃ) নবীজীর এই ইলমে গায়েবকে স্বীকার করেছেন–অথচ আমাদের দেশের জঘন্য জ্ঞানপাপীরা তা স্বীকার-করতে কুণ্ঠিত। দারুস সালামের কথিত ভন্ডপীর আবদুল কাহহার ১৯৯৪ সালে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ঘোষণা দিয়েছিল– "যারা নবী করিম (দঃ)-এর ইলমে গায়েব আছে বলে বিশ্বাস করবে–তারা কাফির"। আমি ১৯৯৫ সালে এপ্রিল মাসের ১লা তারিখে দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এই জাহেল পীরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম–কিন্তু সে মোকাবেলা করেনি। নবীর ইলমে গায়েব অস্বীকার করে সে কুফরীর ফতোয়া মাথায় নিয়ে বর্তমানে কবরে আছে। তার ঘোষণামতে–হযরত আব্বাস (রাঃ), ইবনে কাছির ও কাযী আয়ায (রাঃ) নবীজীর ইলমে গায়েব বিশ্বাস করে কী হয়েছিলেন? নাউযুবিল্লাহ! বে–এলেম পীর সাজলে এমনিভাবেই মানুষকে গোমরাহ্ করে। আল্লাহ বে–এলেম পীর থেকে পানাহ্ দিন। কোন পীর নবীজীর শানে বেয়াদবীমূলক উক্তি করলে সাথে সাথে তাকে ত্যাগ করা ফরয। শরীয়তমতে তাকে কতল করা ওয়াজিব। (ফতোয়া শামী)

ইমামে রাব্বানীর ফতোয়া

হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ) তাঁর মকতুবাত শরীফের প্রথম খন্ড ৩১০ নম্বর মকতুবে লিখেন– (ফারছী .....)

অনুবাদ ঃ **"যে ইলমে গায়ের আল্লাহ তায়ালার জন্যে খাছ–তৎসম্পর্কে তিনি তাঁর বিশেষ বিশেষ রাসুলগণকে অবহিত করে থাকেন"।**

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর খাছ ইলমে গায়েব ৫টি। যথা ঃ কেয়ামত কবে হবে, কখন বৃষ্টি হবে, মায়ের পেটে কি সন্তান আছে, কার রিযিক কোথায় এবং কার মৃত্যু কোথায়? উক্ত ৫টি ইলমে গায়েব সম্পর্কেও আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) অবহিত রয়েছেন (ছুরা জ্বীন)। অথচ আব্দুল কাহহার ফতোয়া দিলেন- "যারা নবী করিম (দঃ)-এর ইলমে গায়ব বিশ্বাস করে–তারা কাফের"। তার ফতোয়ামতেই তার তরিকার ইমামে রাব্বানী (রহঃ) কাফের সাব্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন। (নাউযুবিল্লাহ!) সূত্র ঃ শর্ষিনার তাবলীগ পত্রিকা ১৯৭০ইং মে সংখ্যা। আল্লাহ প্রদত্ত নবীজীর ইলমে গায়েব স্বীকার করে না একমাত্র মউদূদী ও দেওবন্দপন্থীরা।